নারীর প্রতি বৈষম্য

ইমদাদ ইসলাম

গত শতকের আশির দশকের শুরুর দিকে নারী অধিকারকর্মীরা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্লোগান নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন, 'শরীর আমার, সিদ্ধান্ত আমার'। এর মাধ্যমে নারীরা তাদের অধিকারের বিষয়টি সমাজকে জানিয়ে দিয়েছে। জানিয়ে দিয়েছে তারা বৈষম্যের মধ্যে আছে। বাংলাদেশের গত পাঁচ দশকের ইতিহাসের দিকে তাকালে নারীর গুরুত্বপূর্ণ কিছু অর্জন দেখা যায়। বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর সাফল্য চোখে পড়ার মতো। শহর, গ্রাম ও হাওরাঞ্চলের নারীরা এগিয়ে চলেছে। চাকরি ও খেলাধুলার ক্ষেত্রে মেয়েদের সাফল্যজনক অর্জন খুবই প্রশংসনীয়। নারীরা বিমান চালাচ্ছে, পুলিশ কিংবা সেনাসদস্যদের মতো চ্যালেঞ্জিং পেশাতেও নারীদের অংশগ্রহণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এতকিছুর পরও বেশ কিছু ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েছে,যদিও সেগুলো সমাধানে সরকারি বেসরকারি নানা রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে ।

নারীরা সব সময়ই বৈষম্যের মধ্যে আছে। নারীসংক্রান্ত বিষয়ে কেউই তেমন কথা বলতে চায় না। এ বৈষম্য আরও প্রকট পুষ্টির ক্ষেত্রে। গত ৩০ বছরে পুষ্টির বেশ কিছু ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে দেশ। সমস্যার মূল কারণ হলো পর্যাপ্ত ফিজিবিলিটি স্টাডি না করে কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা । পুষ্টির ক্ষেত্রে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্যের বিশ্লেষণ করেছে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল। নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল মতে রক্তস্বল্পতায় ভোগেন দেশের প্রায় অর্ধেক গর্ভবতী নারী এবং প্রসবের সময় দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর সহায়তা পান না ৪১ শতাংশ মা। ১৬ দশমিক ৭ শতাংশ কিশোরী বলেছে, পরিবারে ছেলেদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। এখনো গর্ভবতী নারীদের ঘরে আটকে রাখা ও কম খাবার দেওয়ার প্রবণতা আছে। দেশে রক্তস্বল্পতা বেশি হওয়ার বেশ কিছু কারণের একটি হলো থ্যালাসেমিয়া। একটি এলাকায় সাধারণত চার ধরনের মানুষ দেখা যায়। এরা হচ্ছে (ক) জানে না ও মানে না; (খ) জানে না, কিন্তু মানে; (গ) জানে কিন্তু মানে না, এরা হলো বিপজ্জনক এবং (ঘ) জানে ও মানে । নারীদের খাদ্যতালিকায় বৈচিত্র্য কম, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে পুষ্টি বিষয়ে পরিসংখ্যান বা তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি আছে, গ্রামের তুলনায় শহরের পুষ্টি পরিস্থিতি বেশি খারাপ। নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্বের ঘাটতি রয়েছে। পুষ্টির আলোচনায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, কিশোর-কিশোরীদের অপুষ্টি ও খাদ্যাভ্যাসের মতো বিষয়গুলো কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ফলে এখন কর্মজীবী নারীর সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যস্ততার কারণে কর্মজীবী নারীরা সকালে কোনোরকমে খেয়ে বা না খেয়েই বাসা থেকে বের হন। কাজ শেষে বাসায় ফিরে সঠিক খাবার খান না বা খেতে পারেন না। পাশাপাশি কর্মস্থলে অনেক সময় সঠিক খাবারের ব্যবস্থা থাকে না। অনেক কর্মস্থলে ভালো খাবার পাওয়া যায় না। পুষ্টির জন্য এটা একটা বড়ো সমস্যা। কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে কিশোরীদের আয়রন ট্যাবলেট দেওয়া হয়। তারা তা নিয়ে বাড়িতে ফেরে। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, অসচেতনতার কারণে কিশোরীরা আয়রন ট্যাবলেট ঠিকমতো খায় না। এলাকাভিত্তিক পুষ্টি পরিকল্পনা এখন সময়ের দাবি ।

বাংলাদেশে কিশোরী ও নারীদের প্রতিনিয়তই নানা রকম প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। বাংলাদেশের প্রায় ৪২ শতাংশ কিশোরী (১৫–১৯ বছর) রক্তস্বল্পতায় ভোগে। এ ছাড়া প্রতি দুজন কিশোরীর মধ্যে একজনের ১৮ বছরের আগেই বিয়ে হয়ে যায়। বাল্য বিবাহের কারণে কিশোরীরা স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। তারা অল্প বয়সে গর্ভবতী হয়। ফলে ওই কিশোরী ও তার নবজাতক নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত জটিলতায় ভোগে। আমাদের সমাজে অনেকে বাল্যবিবাহকে অর্থনৈতিক সমাধান মনে করে। অনেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিয়ে দেয়। কিছু জায়গায় বাল্যবিবাহ রীতির মতো হয়ে গেছে। কন্যাশিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যত্ন নিতে হবে। অর্থাভাবে কোনো কন্যাশিশু যাতে শিশুশ্রমে যুক্ত না হয়, সে বিষয়ে নীতিনির্ধারকদের গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে। কন্যাশিশু, কিশোরী, তরুণী কিংবা নারী সবাই কোনো না কোনোভাবে বৈষম্য অথবা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। কন্যাশিশুর বিরুদ্ধে হওয়া সব ধরনের বৈষম্য তাদের যোগ্যতা বিচারের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে যায় এবং একটি জাতিকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে এটির দায়ভার বহন করতে হয়। শিশুর বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছে পরিবার। একটি কন্যাশিশু কতটা বিকশিত হবে, তা নির্ভর করে তার বেড়ে ওঠার পরিবেশের ওপর। তাই শিশুর প্রতি যেকোনো ধরনের আচরণের ব্যাপারে মা–বাবার অবশ্যই সচেতন হতে হবে। পরিবারের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কন্যাশিশু ও কিশোরীদের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব বিকশিত করার সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ নিরাপত্তার নামে নারীদের খেলাধুলার অধিকার কেড়ে নেয়, নিরাপত্তার নামে নারীর শিক্ষা-উচ্চশিক্ষা থেমে যায়, উদ্যোক্তা হতে বাধা দেয়। স্কুলগুলোতে মেয়েদের খেলার মাঠ থাকা নিশ্চিত করতে হবে। শিশু থেকে কিশোরী বয়সের মেয়েদের খেলাধুলায় উৎসাহী করে তুলতে হবে। কন্যাশিশুরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে জানলে পরবর্তী সময়ে

তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশিত হবে। নারী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিতে দেওয়া টাকা যথেষ্ট নয়। বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এর পরিমাণ বাড়ানো দরকার। স্কুলে মিড ডে মিল বা টিফিন পেলে শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়বে। এখনো গ্রামাঞ্চলের কন্যাশিশুদের একটা বড় অংশ প্রাথমিক শিক্ষার পরেই ঝরে পড়ছে। বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছে। অনেক অভিভাবক কন্যাশিশুর পড়াশোনার জন্য খরচ করতে চান না। কন্যাশিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিতে হবে। নানাভাবে হয়রানির শিকার বা মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত কিশোরী ও তরুণীদের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মনস্তাত্ত্বিক নিয়োগের বিষয় বিবেচনা করা দরকার। আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য ও মাসিক স্বাস্থ্যসংক্রান্ত উপকরণ ও সেবা সহজলভ্য করতে হবে। কিশোরীদের অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষকদের যোগাযোগ থাকাও বেশ জরুরি।

আমাদের বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়ের মধ্যে বৈষম্য করেন। অনেক অভিভাবক ভাবেন, ছেলেরাই বড় হয়ে পরিবারের দায়িত্ব নেবে। তাই তাঁরা পরিবারের যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ছেলেদের মতামতকে বেশি প্রাধান্য দেন। ফলে নিজেদের পরিবার ও সমাজে ছেলেরাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। এ ছাড়া আমাদের দেশের নারীরা অনেক সময় সমাজ ও পরিবারের অনেক অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত মেনে নেয় শুধু নিজের অজ্ঞতার কারণে। সে জন্য ডিজিটাল অ্যাকসেস বৃদ্ধি করা জরুরি। কারণ, ডিজিটাল টেকনোলজি ব্যবহার করার মাধ্যমে যেকোনো বিষয়ে নিজের অজ্ঞতা দূর করা সম্ভব।

দেশের নারীরা এখন নানা রকম বাধা পেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের সফলতা সব সময় পিছিয়ে পড়াদের অনুপ্রাণিত করে। দেশের অর্ধেক জনসংখ্যাকে যুগ যুগ ধরে কাঠামোগত জেন্ডার বৈষম্যের মাধ্যমে পিছিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের এগিয়ে আনার মূল দায় এবং দায়িত্ব রাষ্ট্রের। পরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নকে বাস্তবায়ন করতে হবে। আমাদের নারীবান্ধব সমাজ তৈরির চেষ্টা করতে হবে। ভয় দেখিয়ে নারীদের নিরাপত্তা ও সম্মান নিশ্চিত করা না। একেবারে শিকড় থেকে নারীবান্ধব সমাজ তৈরিতে কী কী করা যায়, সে বিষয়ে রাষ্ট্রকে সচেতনভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের পরিবার নিরাপত্তার নামে বাল্যবিবাহ দেয়। সুতরাং বাবা-মা'র সিদ্ধান্তের বিষয়টিও এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার কম যা বর্তমানে ৩৭.০৪৫ শতাংশ, যেখানে OECD দেশগুলোতে ৫২.৭৬ শতাংশ এবং বিশ্বব্যাপী ৪৭.৮৪ শতাংশ (সূত্র : বিশ্ব উন্নয়ন সূচক)। এই বৈষম্য নারীর অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে এবং শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণে সুযোগের ব্যবধান পূরণকল্পে পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজন। অধিকন্তু, মাতৃমৃত্যুর অনুপাত (প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে ১২৩) এবং বয়ঃসন্ধিকালের সন্তানধারণের সক্ষমতার হার (১৫-১৯ বছর বয়সি প্রতি ১,০০০ মহিলার মধ্যে ৭৫.৪৯ জন্ম)-এর মতো মাতৃস্বাস্থ্য সূচকগুলোর উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জগুলো প্রকাশ করে যা নেতিবাচকভাবে নারী উন্নয়ন প্রভাবিত করে। একজন নারী যখন নিজে উপার্জন করা শিখবেন, তখন তাঁর নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

নারীদের নিরাপত্তা না থাকলে বড়ো কোনো স্বপ্নই দেখা সম্ভব হবে না। দেশের অর্ধেকের বেশি জনগোষ্ঠী নারী। যদি তাদের অধিকার নিশ্চিতই না হয়, তাহলে এই স্বাধীনতার ফল দেশের উন্নয়নে তেমন কোন ভূমিকা রাখবে না। সুতরাং রাষ্ট্রকে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আমরা নারীদের জন্য এবং তাদের অধিকারের জন্য নিরাপদ বাংলাদেশ চাই। একটি মেয়ে যা হতে চায়, করতে চায়, সে যেন তা—ই করতে পারে। শারীরিক, মানসিক এবং চলাফেরার ক্ষেত্রে সে যেন নিরাপদ থাকে। সাইবার নিরাপত্তা নিয়েও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

জাতির সংকটে নারীরা নারী হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে সব সময় অংশগ্রহণ করেছে। নতুন বাংলাদেশে সেই নারীদের বিভিন্ন নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় অংশগ্রহণ আরও দৃশ্যমান করা প্রয়োজন।

#

পিআইডি ফিচার